

ধর্ম চেতনা ও ঈশ্বর-বিশ্বাস

-- ওয়াহিদ রেজা --

(ডাঃ ওয়াহিদ রেজা বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি ও কথাসাহিত্যিক। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখকের ব্যক্তিগত অনুমতি নিয়ে “দুইবাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম ; সম্পাদনা প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩; প্রকাশ :জানুয়ারি ২০০২” গ্রন্থ থেকে অনুলিখিত। লেখাটি মুক্তমনার জন্য অনুলিখন করেছেন [অনন্ত](#)।)

পূর্ববর্তী পর্বের পর

পর্ব-২

‘ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন’ এই তত্ত্বটির মধ্যে রয়েছে ধর্মের সবচেয়ে বড় ফাঁকি। আদমের উৎপত্তি কাল থেকে বাইবেলের হিসেব অনুযায়ী আব্রাহাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন আদমের ১৯৪৮ বছর পর। এবং আব্রাহামের জন্ম থেকে যীশুর আবির্ভাব ঘটেছিলো ১৮৫২ বছর পর। অর্থাৎ আদম থেকে যীশুর সময়ের ব্যবধান ৩৮০০ বছর। বাইবেলে বিশ্বসৃষ্টির সময়কাল যেমন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি পৃথিবীতে কবে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো তাও নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। আজকের ১৯৯৭ সনকে ভিত্তি হিসেবে হিসেবে ধরে নিলে ওই হিসেব অনুসারে দেখা যায় আজ থেকে মাত্র ৫৭৯৩ অথবা ৫৭৯৪ বছর আগে (যীশুর জন্মের ৩/৪ বছর পর থেকে খ্রীষ্টীয় সন গণনা শুরু হয়, সেই হিসেবে) বিশ্বসৃষ্টির সূচনা ঘটেছিলো। আর মানুষ সৃষ্টি হয়েছিলো, অর্থাৎ প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে- এর মাত্র দিন কয়েক পরেই। বাইবেলের এই সৃষ্টিতত্ত্বকে ইসলাম সমর্থন করে। কিন্তু এই সৃষ্টিতত্ত্ব আজ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত মিথ্যে।

এখন থেকে প্রায় ২৫০০০ বছর আগে বিশুদ্ধ আধুনিক মানুষ ক্রোম্যাগনন্ মানুষ বা **Homo Sapiens** -এর উদ্ভব। তার আগে পর্যন্ত বহু হাজার বছর ধরে নিয়ানডার্থাল (**Neanderthal**) মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্তে টিকে ছিলো। তারা ছিলো শিকারী, গুহায় বসবাস করতো। পরিবার গঠনের প্রাথমিক প্রয়াস তাদের মধ্যেই লক্ষ করা গেছে। তাদের মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের মতো উন্নত ও জটিল না হলেও পূর্ববর্তী যে কোনো মানব প্রজাতির চেয়ে বিকশিত ছিলো। এবং এর সাহায্যে তারা দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য নানা কিছু মতো, জীবনের রহস্য ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা অথবা এ ব্যাপারে চিন্তা করতে পারার প্রচেষ্টায় তারা সফল হতে পেরেছিলো বলেই মনে হয়। কারণ মাটি খুঁড়ে তাদের কবরের গুহা ও গহ্বর থেকে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, মৃত্যুর পরেও যাতে মৃত ব্যক্তির কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের কিছু দ্রব্যাদি শবের সঙ্গে রেখে দেওয়ার পদ্ধতি তারা অনুসরণ করতো। মৃত শরীরকে নষ্ট না করে বা অবহেলায় ফেলে না রেখে কবর দেওয়ার ব্যাপারটিও ছিলো অভিনব ও যুগান্তরকারী একটি আবিষ্কার। আর এভাবেই মৃত্যু পরবর্তী ‘প্রাণ’ বা প্রাণের কারণ হিসেবে ‘আত্মা’ জাতীয় কোনো একটি কিছুর সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা যে তারা ধীরে ধীরে শুরু করেছিলো তা বোঝা যায়।

মানুষের লিখিত ইতিহাসের বয়স মাত্র ৫০০০ বছর। ৭/৮ হাজার ধরে সে ধাতু ব্যবহার করেছে। তার আগে লক্ষ লক্ষ বছর আদিম মানুষ পাথরই ব্যবহার করতো, তখন তাদের ধর্মচেতনাও ছিলো অনুরূপভাবে আদিম। কিন্তু ধর্মের প্রাথমিক উপাদান ৪০/৫০ হাজার বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানুষের চেতনাতেই উদ্ভাসিত হয়। সম্ভবত তারাই প্রথমে আত্মা, অলৌকিক শক্তি,

অতীন্দ্রিয় শক্তি ইত্যাদি ধারণার ভিত্তি সৃষ্টি করে। আত্মার আদিম ধারণাই হাজার হাজার বছর পল্লবিত হয়েছে ওই আদিম মানুষের মনে। আর সেটাই বহু সহস্র যুগ নিয়ানডার্থাল থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর বংশ পরম্পরার ধারাবাহিকতায় ক্রম বিবর্তনের ফলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, তথা প্রাণের সৃষ্টিকর্তা ও সমস্ত আত্মার উৎস-স্বরূপ এক পরমশক্তি বা পরমেশ্বরের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে ধর্মগুলোর সৃষ্টি হয়েছে বড় জোর বিগত ২ থেকে ৪ হাজার বছরের মধ্যে। এখনো অধি পাওয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে এটি জানা গেছে, মানুষের মনে ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিলো এখনকার মানুষের পূর্বসূরী নিয়ানডার্থাল, মানুষের আমলে - যারা পৃথিবীতে ছিলো এখন থেকে আড়াই লক্ষ থেকে ৪০/ ৫০ হাজার বছর আগে **Mousterian Period, Pleistocene epoch** -এর একটি অংশ। তখন শাসক শাসিত শ্রেণীবিভাগ ছিলো না। মানুষ নিছক তার অনুসন্ধিৎসার ফলে, অজ্ঞতা ও অসহ্যতার কারণে তার ‘উন্নত’ কল্পনাশক্তির সাহায্যে তথাকথিত আদি ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তখনকার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এটি ছিলো একটি উন্নতর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। ধর্মকে শাসক শ্রেণীর অপব্যবহারের কাজ, যা ঐতিহাসিক প্রকৃয়ায় সৃষ্টি হয়েছে, সেটা অনেক অনেক পরের ব্যাপার। নিয়ানডার্থাল মানুষের আগের স্তর অর্থাৎ পিথেকানথ্রোপাস (**Pithecanthropus erectus**) বা সিনানথ্রোপাস (**Sinanthropus Pekinensis**)-দের মধ্যে ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তখনকার মানুষের মস্তিষ্ক তথা চিন্তা করার ক্ষমতা এতোটা উন্নত ছিলো না, যার সাহায্যে ধর্ম ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি জাতীয় উন্নতর চিন্তা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতো। মানুষকে তখন স্থূল জৈবিক প্রয়োজনেই প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা ও জীবজন্তুদের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। নিতান্তই ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাদের চেতনা ব্যতিব্যস্ত ছিলো। প্রাণ ও প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু হাজার হাজার বছরের অস্তিত্বের মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, জীবনযাত্রা রূপান্তরিত হয়েছে, পথ পরিষ্কার হয়েছে নিয়ানডার্থাল সৃষ্টির। ধর্ম আলোচনার প্রসঙ্গে নিয়ানডার্থাল মানুষের আগেরকার ঐ অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা বলে **প্রাকধর্মীয় অবস্থা (Pre-religion stage)**। এরপর উদ্ভব হয় নিয়ানডার্থাল মানুষদের, পৃথিবীতে তখন চতুর্থ হিমযুগ চলছে। ১৮৫৬ সালে জার্মানির ডুসেলডর্ফের কাছে নিয়াডার উপত্যকায় পাওয়া গেলো এই ধরনের ভিন্নতর ও উন্নতর মানুষের অসম্পূর্ণ কঙ্কাল। তার আগে জিব্রাল্টারেও অবশ্য এ ধরনের একটি কঙ্কাল পাওয়া যায়। পরে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালী, স্পেন, রাশিয়া, পোল্যান্ড, ক্রিমিয়া, এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, উত্তর আরবের মরুভূমি অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা, চীন ইত্যাদি বহু অঞ্চলে, এ ধরনের মানুষের কঙ্কাল, কবর ও অন্যান্য নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ক্রোম্যাগনন্ মানুষের মতো বুদ্ধিমান মানুষের অস্তিত্বের পর্যাপ্ত ও সঠিক প্রমাণ বিজ্ঞানের হাতে এখন মজুত আছে। আজ এ সব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের কাল ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত গল্প-কথার প্রথম আদম সৃষ্টির সময়কালের চেয়েও অনেক-অনেক বেশী প্রাচীন। মজার ব্যাপার হলো এই মানুষ সম্পর্কে বাইবেলেই রয়েছে উল্টোপাল্টা, স্ববিরোধী কথাবার্তা। অস্ট্রেলিয়ার ‘**র‍্যাশনালিষ্ট এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস**’ বাইবেল থেকে এমন পরস্পর বিরোধী বহু উদাহরণ প্রকাশ করেছেন। এখানে কেবল মাত্র মানুষ সম্পর্কিত বাইবেলের ৬টি স্ববিরোধী উক্তি উল্লেখ করা হলো :-

(১) **মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগে গাছ হ্রদো (জেনেসিস ১: ১১-১২), মানুষ তৈরি হওয়ার পর গাছ সৃষ্টি হ্রদো (জেনেসিস ১: ৭-৯)।**

(২) **জন্তু জানোয়ারদের পরে মানুষ সৃষ্টি হ্রদো (জেনেসিস ১: ২৫-২৬), জন্তু জানোয়ারদের আগে মানুষ সৃষ্টি হ্রদো (জেনেসিস ২: ১৮-২০)।**

(৩) আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার দিনই মরবে (জেনেসিস ২ : ১৭), আদম ৯৩০ বছর বেঁচে ছিলো (জেনেসিস ৫ : ৫)।

(৪) ঈশ্বর মানুষকে নোভ দেখান না (জেনেসিস ১ : ১৩), ঈশ্বর মানুষকে নোভ দেখান (জেনেসিস ২২ : ১/২, ম্যাথুয়েন ২৪ : ১)।

(৫) কোনো মানুষ ঈশ্বরকে দেখেনি বা দেখতে পারেন না (জেন ১ : ১৮/১, টিম ৬ : ১৬), অনেকের কাছেই তিনি দেখা দিয়েছেন (জেনেসিস ২৬ : ২, এলোডাম ২৪ : ৯-১০, ও৩ : ২২-২৩)।

(৬) কেউই ঈশ্বরের মুখ দর্শন করার পর বেঁচে থাকতে পারে না (এলোডাম ও৩ : ২০), জেকব ও মুসা দু'জনেই ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখেছেন কিন্তু মরেন নি (জেনেসিস ও২ : ৩০, এলোডাম ও৩ : ১১)।

বাইবেলের আরো যে বিখ্যাত অপবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে তা হলো পৃথিবী সম্পর্কিত তত্ত্ব। বাইবেল ও কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবী স্থির। কিন্তু এখন আমরা নিশ্চিত, পৃথিবী স্থির নয়। সে ঘুরছে। আজ থেকে চারশ বছর আগে খ্রীষ্টধর্মের পাড়া-পুরুতগণ ক্রনোকে ক্রুশে বেঁধে জীবনত পুড়িয়ে মেরেছিলেন কেবলমাত্র এই অপরাধের জন্য যে, তিনি এরিস্টটলের তত্ত্বকে অস্বীকার করে কোপার্নিকাসের (The Revolution of the Heavenly Bodies)-গ্রন্থের মতবাদকে সমর্থন করে বলেছিলেন, সূর্য স্থির নয়, এই পৃথিবীটাই ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। এটা ছিলো বাইবেলে বর্ণিত পৃথিবীতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিরোধী মতবাদ।

এখানে এ বিষয়ে একটি কথা বলে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী যে, কোপার্নিকাসেরও দু'হাজার বছর আগে মানব সভ্যতার কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, পৃথিবী বৃত্তাকার, সে একটি গ্রহ এবং ঘূর্ণায়মান। আয়োনীয়া সভ্যতার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে তিনটি সুপষ্ট স্তরে ভাগ করা চলে - আয়োনীয়া, এথেনীয় ও হেলেনীয় যুগ। এ তিনের মধ্যে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের চরম উৎকর্ষের দাবি রাখে আয়োনীয়া সভ্যতা। আয়োনীয়া যুগ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। আয়োনীয়া সভ্যতাতেই প্রথম ঘটেছিলো বস্তুবাদের উন্মেষ। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আয়োনীয়ার মাইলেটাস ছিলো গ্রীক জগতের বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র এবং সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিয়াকশ ঘটে। যাকে অনেক ভাববাদী ঐতিহাসিকগণ অলৌকিক বলে অভিহিত করেন। কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে আয়োনীয়ার যে প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিলো তা অলৌকিক কিছু তো নয়ই, আকস্মিকও নয়। গ্রীক সভ্যতা ছিলো পূর্বাগামী প্রাচ্য সভ্যতার অনুবৃত্তি। গ্রীক বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ভিত্তিভূমি দীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়েছিলো মিশর ও ব্যাবিলনিয়ার। ভৌগলিকভাবেও মাইলেটাস ছিলো প্রাচীন সভ্যতাগুলোর নিকটবর্তী। মিশরের সাথে জলপথে এবং ব্যাবিলনের সঙ্গে স্থলপথে এর যোগাযোগ ছিলো। বস্তুতঃ গ্রীক পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ যে প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্রগুলো ভ্রমণ করতেন তা নিশ্চিত ধারণা করার সঙ্গত কারণ আছে। আর এই আয়োনীয়াতেই তিনশ' বছর আগে হোমার যে ধর্মীয় সংস্কারহীন মুক্ত চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছিলেন, তা আয়োনীয়া বিজ্ঞানের উৎপত্তি ভাবগত পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিলো। আয়োনীয়াতে যে বিজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো, সে বিজ্ঞান হলো, অধ্যাপক বেঞ্জামিন ফ্যারিংটনের ভাষায় - 'একটি বিজ্ঞানমনস্ক নবীন জাতির স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা, একটি বদ্বিষ্ট মানবতাবোধ এবং একটা বিশ্বজনীন অংস্কৃতির মিশ্রিত ফল।'

আয়োনীয়া যুগ বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাসে মানুষের এক গৌরবময় অধ্যায়। আয়োনীয়া দর্শন ছিলো বস্তুবাদী দর্শন।

কিন্তু আয়োনীকদের এই বিজ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ স্থায়ী হয়নি। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আয়োনীক সভ্যতার বিলুপ্ত ঘটে। পারসিক আক্রমণে আয়োনীক রাজনৈতিক ও সামাজিক গোলযোগ দেখা দেয়। এর ফলে সেখানকার বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ বাস্তুহারা হয়ে পড়েন। মানব সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সবচেয়ে উজ্জ্বল সভ্যতা আয়োনীক হয়ে পড়ে মৃত!

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আয়োনীকরা ২৬০০ বছর আগেই এমন উন্নতি সাধন করেছিলো যা আজ ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। আজ আমরা মানুষেরা পৃথিবী নামক শ্যামল গ্রহে বসে চাঁদ এবং মঙ্গলকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা করছি, যে স্বপ্ন দেখছি, সেই মানুষেরা তাদের জ্ঞানের সংগ্রাম শুরু করেছিলো লক্ষ বছর আগে। তারপরও তথাকথিত ঈশ্বর, দেবতাদের প্রভাবকে এড়িয়ে, একটি সাধারণ নিয়মের মাধ্যমে পদার্থ ও বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা প্রথম হয়েছিলো আয়োনীকরাতে - থেলিস, অ্যানাক্সিম্যান্ডার, অ্যানাক্সিমেনিস, হিরাক্লিটাস, পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, এমপিডক্লাস, অ্যানাক্সাগোরাসের মতো বিজ্ঞানীদের হাতে। তাঁরা বলেছিলেন, **অবশিষ্ট পরমাণু দিয়ে তৈরি, মানব প্রজাতি বা অন্যান্য প্রাণীদের উদ্ভব ঘটেছে খুবই অল্প অবস্থা থেকে, এ কোনো ঈশ্বর বা দেবতাদের কার্যকাজ নয়, পৃথিবী শুধুই একটি গ্রহ যা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘোরে আর নক্ষত্রেরা অনেক দূরে।** তাঁরাই ছিলেন কৃষকের, নাবিকের, তাঁতীদের সন্তান। এঁদের হাতে ছাব্বিশশো বছর আগে বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিলো। তারপরেও তাদের ধ্বংস হয়ে যেতে হয়েছে কোনো ধারাবাহিকতা না রেখে। এর শত বছর পরে অনেকটা একইভাবে, তবে আরো সুসংগঠিত চিন্তা আর কসমোপলিটন স্বপ্ন নিয়ে জেগে উঠেছিলো ভূমধ্যসাগরের তীরে আলেক্সান্দ্রিয়া। তাঁরা পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেছিলেন, স্টীম ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছিলেন। এখানে কাজ করেছিলেন ইরাটোস্টেনিস, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, অ্যারিস্টোকার্স, হাইপেশিয়ার মতো মহাকাশের প্রতিভারা। এখানেই গড়ে উঠেছিলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। কিন্তু তাদেরকেও ধ্বংস হয়ে যেতে হয়েছিলো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উন্মাদনার করাল গ্রাসে কোনো ধারাবাহিকতা না রেখে। পর্যায়ক্রমে রোমান, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের বর্বরা তাদের ধর্মীয় উন্মাদনায় পুড়িয়ে দিয়েছে আলেক্সান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের হাতে লেখা পাঁচ লক্ষাধিক বই। এর ফলে নেমে এসেছিলো মধ্যযুগীয় অন্ধকার, আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম দেড় হাজার বছর। আলেক্সান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে ব্যাবিলনের এক ধর্মযাজকের লেখা একটি গ্রন্থে ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখিত সময়পুঞ্জির চেয়ে শতগুন পুরাতন সময়ের ইতিহাস ছিলো - প্রায় ৪ লক্ষ ৩২ হাজার পূর্বের। কী লেখা ছিলো সেই গ্রন্থে? এই প্রশ্নের উত্তরকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের বর্বর পাভা-পুরুতগণ। তারপর অনেক অনেক যুগ পেরিয়ে এসে কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিওর মতো পণ্ডিতদের অনেক কিছুই পুনঃআবিষ্কার করতে হয়েছিলো।

কোপার্নিকাসের পুনঃআবিষ্কারকেই ক্রনো সাহসীকতার সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, নিকোলাস কোপার্নিকাস নিজে যা প্রচার করতে পারেন নি ধর্মীয় গুণ্ডাদের ভয়ে। আর সেটাই করেছিলেন বিজ্ঞানের নির্ভুল সত্য প্রচারের নির্ভীক সৈনিক এবং প্রথম শহীদ জিওর্দানো ব্রনো। এটাই ছিলো তাঁর অপরাধ। এ জন্যই তাঁকে ধর্মীয় উন্মাদরা ইতালীর পিয়ম্বো নগরে দীর্ঘ আট বছর বন্দি করে রেখেছিলেন এমন একটি ঘরে যার ছাদ ছিলো সীসে দিয়ে তৈরি। গরমের সময় ঘরটি হয়ে উঠতো প্রায় অগ্নিময় আর শীতকালে বরফের মতো হিমশীতল। বিচারের সময় ক্রনো ধর্মযাজকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, **‘শাস্তির কথা শুনে আমি যতোটা ভয় পেয়েছি তারচেয়েও অনেক বেশি ভয় পেয়েছো তোমরা’**। ১৬ জন প্রধান ধর্মযাজক তাঁর মৃত্যুদণ্ড রায়ের ঘোষণায় বলেন, **‘পবিত্র গীর্জার আদেশে পাপী ব্যক্তির একবিন্দু রক্তও নষ্ট না করে প্রাণদণ্ড কার্যকর করতে হবে।** ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে রোমে ক্রনোর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় তাঁকে ক্রুশে বেঁধে, প্রকাশ্য দিবালোকে, অগ্নিদগ্ধ করে।

ক্রনো কোপার্নিকাসের চিন্তাকে আরো প্রসারিত করেছিলেন। ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, কতগুলো গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, পৃথিবীও সেই গ্রহগুলোর একটা। আরো অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হবে এটাই সৌরজগৎ। দূরের নক্ষত্রগুলোও এক একটি সূর্যের মতো, তাদেরও অনেকেরই আছে গ্রহ কিংবা গ্রহমন্ডলী। শুধু পৃথিবীই নয়, সূর্য ঘুরছে তার আপন মেরুতে। এই বিশ্ব অসীম। এর কেন্দ্রে বা প্রান্তে কিছু আছে এ কথা বলা অর্থহীন।

পৃথিবী যে স্থির নয়, সে যে ঘুরছে, এ কথা আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। ক্রনোর মতবাদই বিজ্ঞানে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। মিথ্যে হয়ে গেছে বাইবেলের বয়ান। এতো গেলো ইসলাম পূর্ব বাইবেলের মিথ্যাচার। কিন্তু ইসলাম, মাত্র ১৪০০ বছরের নির্ভুল, আধুনিক (!) ধর্ম? সে বাইবেলের একই ভুলকে কী করে প্রশ্রয় দেয়? ইসলামের আল্লাহ যদি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সর্বজ্ঞানের জ্ঞানীই হন তাহলে তিনি কী করে বাইবেলের মিথ্যে বর্ণনাকে সমর্থন করতে পারেন? **কোরানের**

২৭:৬১ ও ৩০:২৫ পঙক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, পৃথিবী স্থির।

১৯৯০ সালে কলকাতার মল্লিক ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত জৈনক মুহম্মদ নুরুল ইসলাম তাঁর ‘পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে’ নামক গ্রন্থে কোরানের ১১টি সুরার ১২টি পঙক্তি দ্বারা জোরজবরদস্তি প্রমাণ করতে চেয়েছেন- পৃথিবী অনড়, স্থির। তাঁর মতে পৃথিবী যদি সত্যি সত্যি ঘুরতো তাহলে আমরা সমস্ত জীবজন্তু উড়ে উড়ে ছিটকে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতাম, আর গাছপালা-দালান-কোঠা পাহাড়-পর্বত সব ভেঙ্গেচুড়ে তছনছ হয়ে যেতো! তাঁর এই অপবৈজ্ঞানিক ধারণাকে আজ কোনো বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একে ধর্মীয় অন্ধত্বের উন্মাদনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। এ সমস্ত উন্মাদদের গাঁজাখুরি অপব্যখ্যা এবং বাইবেল, কোরানের পৃথিবীর অনড়ত্বকে মিথ্যে প্রমাণিত করে আমাদের শ্যামল পৃথিবী নামক গ্রহটি ঘুরেই চলছে সেকেন্ডে সূর্যের চারিদিকে ১৬ মাইল বেগে। আর সূর্য অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে নিয়ে ছুটে চলছে আন্তঃনাক্ষত্রিক শূণ্যতার মধ্য দিয়ে সেকেন্ডে ৪২ মাইল গতিতে। এবং এইভাবে পুরো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে একবার ঘুরে আসছে ২৫ কোটি বছরে। কি স্বপ্নের মতো এই বিজ্ঞান, অথচ আজ বাস্তব এবং সত্য। আর কি চকমকে সত্যের মতো মানুষের ধর্মচেতনা ও ঈশ্বর বিশ্বাস, যা আসলেই অবাস্তব ও অলীক।

.....মমাদ্দ

অনুলিখিত : ২৯-০৩-০৬